করোনাকালের অবসান কোন পথে

অরুণাভ সেনগুপ্ত

এক চীনা ভদ্রলোকের অদ্ভুত নৈশ আহার থেকে শুরু এক আচম্বিত দৈবদুর্বিপাকের জন্য অপ্রস্তুত সারা পৃথিবী কিয়ামতের কালে উপস্থিত – করনার কাহিনীটা যে এমন সরল নয় তা এখন জানা। যদিও কাহিনীটার শেষটা এখনও অজানা, প্রছন্ন অন্তঃস্থিত নানা রাজনীতি ব্যবসাদারির উপকাহিনী, তবুও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে এমনি ওতপ্রোত জড়ান এ কাহিনীর বিবর্ধন যে কটা মোটা কথা গোটা অক্ষরে বারবার লেখা দরকার। প্রথমত দুর্বিপাকটি আচম্বিত তো নয়ই, দৈবও নয়। জলে জঙ্গলে বিচ্ছিন্ন জীবজগতে মানুষের অপরিণামদর্শী দখলদারির জন্য অন্য প্রজাতির শরীরস্থিত অণুজীবরা যে ক্রমশ লাফিয়ে মানব প্রজাতিকেও আশ্রয় করছে সেটা দেখাই যাচ্ছিল। ফলে অবধারিত ভাবেই ভাইরাস বাহিত ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় অসুখের আরও একটি অতিমারী যে অচিরেই ঘটবে তা আঁচ করে বিভিন্ন কল্পিত পরিস্থিতি অনুযায়ী দেশে দেশে পরিকল্পনা কত হাঁসপাতাল শয্যা, কত ভেন্টিলেটর, কত পি পি ই, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার সরঞ্জাম, মাস্ক, স্যানিটাইসার, সামাজিক দূরত্বের প্রয়োগবিধি, কোথায়, কখন, কি ভাবে অনেক দিনই তৈরি যাতে সংক্রামণ শুরু হলেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নেমে পড়া যায়। এদেশে সে পরিকল্পনার কি হল, নাটকীয় পদক্ষেপের বদলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ধাপে ধাপে এগোন কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভূমিকায় পরিস্থিতি অধিক সহনশীল হত কিনা সেটা অন্য আলোচনা কিন্তু তিন মাস বাড়তি সময় পেয়েও সরকারের অপরিণত ভাবনার প্রমাণ ১৪ ই মার্চের করনায় মৃত্যুর জন্য ১০ লক্ষ টাকা অনুদানের ঘোষণা আর পরের দিনই তা প্রত্যাহার। বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার তিনটিই উপায়। আলাদা ভাবে নয়, এক সাথে। প্রথম উপায় আক্ষরিক অর্থেই গন-প্রতিরোধ। সবাই মিলে মুখাবরণ পরে, স্পর্শ বাঁচিয়ে, ভাইরাসদের এক শরীর থেকে অন্য শরীরে গমন রোখা। ইন্দোনেশিয়া ছাড়া চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া সহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অধিবাসীরা, সৈনিকের শৃঙ্খলায় গণস্বাস্থ্য বিধি পালন যাদের নানা কারণে অধুনা প্রকৃতিগত অভ্যাস, দেখিয়ে দিয়েছেন তাতেই ৭০-৮০ শতাংশ কাজ হাঁসিল। এ সম্বন্ধে উদাসীনতার প্রশ্রয় যেমন গণশিক্ষার অভাব তেমনি দুর্বল জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিচয়। আরেকদিকে সভ্য অগ্রসর দেশে মুখাবরণকে স্বতন্ত্রতার পরিপন্থী কেন ভাবলেন কিছু লোক এটা একটা বিস্ময়। মুখোসে বিমুখ মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিজেই আক্রান্ত হয়ে সম্ভবত অনিচ্ছাকৃতভাবেই এ সম্বন্ধে সবচেয়ে জোরাল বার্তা দিলেন। দ্বিতীয় উপায় প্রতিষেধ ও চিকিৎসা। চিকিৎসা শাস্ত্রের সার্বিক উন্নতি মৃত্যুহার কম রেখেছে সন্দেহ নেই কিন্তু নির্দিষ্ট ওষুধ ও প্রতিষেধক এখনো নাগালের বাইরে। ঠিক সময়ে আসবে কিনা জানা নেই। সারস বা মারস অন্য দুই করোনার প্রতিষেধক কিন্তু সময়ে আসে নি। অথবা এলেও ভারতবর্ষ কতটা পাবে? ভারত বৃহত্তম ভ্যাক্সিন প্রস্তুতকারী দেশ, গরীবদের কম দামে ভ্যাক্সিন দেবার জন্য তৈরি এক

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা- সদস্য, কিন্তু আবিষ্কারক নয়। আবিষ্কৃত ভ্যাকসিনের স্বত্বাধিকার ও তার বণ্টনের নিয়ম কানুন খুবই জটিল। ধনী দেশগুলি আগেই মোটা টাকার বরাত দিয়ে রেখেছে। হিসাব মত প্রায় ৮০ কোটী ভারতবাসীকে ১৬০ কোটী ভ্যাক্সিন দিতে হবে। এত ভ্যাক্সিন হিমায়িত অবস্থায় বাজারজাত ও কালো বাজারী রুখে ন্যায্য ভাবে বিতরণ করা সহজ কাজ নয়। ভ্যাক্সিনের কার্যক্ষমতা কতদিন থাকবে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিনের মত ফি বছর দিতে হবে কিনা, কারা আগে পাবে, কোথায় পাবে, কত দামে পাবে, সরকার কতটা ভার নেবে, অনেক প্রশ্নই এখনও অমীমাংসিত। পরিত্রাণের তৃতীয় উপায় বিবর্তনবাদের শর্ত, যে মানিয়ে চলতে পারে সেই বাঁচে, অনুযায়ী নিজেদের স্বার্থেই ভাইরাসদের প্রয়োজনীয় বিবর্তন ও মারণ ক্ষমতার হ্রাস। কারণ সব মানুষকে মেরে ফেললে ভাইরাসরা নিজেরাই আশ্রয় হারা হয়ে বংশলুপ্ত হয়ে যাবে। তৃতীয় উপায়টিই আমাদের বাঁচাবে নাকি শীতকালে উল্টোদিকে বিবর্তিত হয়ে আরও মারাত্মক বংশগতির সন্ততিদের নিয়ে করোনা নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে এখন যেখানে শীতকাল চলছিল সেই ভৌগোলিক দক্ষিণ গোলার্ধে করোনা সংক্রমণের বিস্তার ও গতি বিশ্লেষণ করে। একটা বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ এখানে জরুরী । ভৌগোলিক দক্ষিণ গোলার্ধের বেশীর ভাগ দেশ অর্থনৈতিক বিচারেও দক্ষিণ, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও তথ্য সংগ্রহ দুর্বল। গুনতিতেই ভুল হতে পারে। দ্বিতীয়ত বিশ্লেষণের সময় ধরে নেওয়া হচ্ছে সংক্রমণের বিস্তার সর্বত্র সব দিনে সব বয়সে ও সামাজিক অবস্থায় একই গতিতে হচ্ছে এবং প্রতিরোধী ব্যবস্থা গুলিও সর্বত্র সমান কার্যকরী। অথবা যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, ১৫ দিন বা ২১ দিন, হয় ভাল হয়ে যাচ্ছেন বা মরে যাচ্ছেন। দুটো অনুমানই ভুল হতে পারে। অতিমারী শেষ না হলে সঠিক সংখ্যা বলা মুস্কিল। সে যাই হোক যা ভাবা গিয়েছিল অবস্থা তার থেকে ভাল। আফ্রিকার ক্ষেত্রে প্রক্ষেপণ ছিল কয়েক লক্ষ মৃত্যুর, বাস্তব সংখ্যা ৩ অক্টোবর অবধি ছত্রিশ হাজার, সমসংখ্যক লোকের দেশ ভারতের এক তৃতীয়াংশ। আর্জেন্টিনা ছাড়া দক্ষিণের বাকি সব জায়গায় সংক্রমণের হার পড়তির দিকে এবং অনেক দেশেই লম্বা ঢাল বেয়ে ঢিমেতালে নামা নয়, বেশ দ্রুত পতন। পরে সংক্রামণ শুরু হওয়ার বাড়তি সময়টা যে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশরা নির্দেশিত ব্যবস্থা গ্রহণে ভালই কাজে লাগিয়েছে তার প্রমাণ সেখানে এ বছর মরশুমি ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণও অন্য বছরের তুলনায় প্রায় নগণ্য। সংক্রমণের হার কমছে প্রতিবেশী পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়নামারেও। ওসব দেশে পরীক্ষার হার কম তাই ধরা পড়ছেও কম খালি এই যুক্তিই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। আশার কথা যে যে বিষয় সংক্রামণের হার কমার সম্ভাব্য কারণ বলে অনুমিত- তরুণ জনগোষ্ঠী, সার্বজনীন বি সি জি টিকা করন, বিভিন্ন সংক্রমণে শরীরে সংমিশ্রিত প্রতিরোধী ক্ষমতার সৃষ্টি, দেরীতে শুরু হওয়া প্রাদুর্ভাব - সে সবই ভারতেও বিদ্যমান কাজেই প্রাকৃতিক কারনেই সংক্রমণ এখানেও এবার কমা উচিত, যদি সব ভুলে উৎসবে না মাতি। দ্বিতীয় ঢেউ আসলে অবশ্য অন্য কথা। সে ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তটা নিদারুণ হবে।

আপাতত ফুল খেলিবার দিন নয় অদ্য এই বোধ নিয়ে বাঁচাই শ্রেয়। স্থগিত থাক মুখোমুখি বসিবার ক্ষণ। চাপা থাক মুখাবরণের আড়ালে শ্রাবস্তির কারুকার্য, মোনালিসার হাঁসি। আপাতত।